গুলি খেয়ে মৃত্যু আসানসোলের সালানপুর আইসি’র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ নিজের চেম্বারেই রহস্যজনকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সালানপুর থানার আইসির। মৃত পুলিশ অফিসারের নাম সিদ্ধার্থ ঘোষাল। মঙ্গলবার সকালে তার চেম্বারের পিছনে বাথরুমের কাছ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পুলিশ কর্মীরাই তাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি আসানসোলের একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও তার অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপরে দুর্গাপুরে বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। সেই মতো হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সুপার স্পেশালিটি ভেন্টিলেশন সিস্টেম দেওয়া অ্যাম্বুলেন্স। পুলিশ অফিসার সিদ্ধার্থ বাবুকে সেই অ্যাম্বুলেন্সে চাপানোও হয়। কিন্তু তার পরেই অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরেই চিকিৎসা করা হয় সিদ্ধার্থ বাবুর। তার বুকে ক্রমাগত পাম্প করতে থাকেন চিকিৎসকরা। শেষ পর্যন্ত প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে পুনরায় তাকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে হাসপাতালে ঢোকানো হয়। তখনই মোটামুটি হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ জন ধরেই নিয়েছেন, লড়াই শেষের দিকে।

কিন্তু পরবর্তী ২ ঘণ্টা ধরে পুলিশ আধিকারিক বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধার্থ বাবুর

শারীরিক অবস্থা নিয়ে অদ্ভুতভাবে মুখে কুলুপ আঁটেন।

শেষ পর্যন্ত বিকেলে পুলিশ কমিশনার লক্ষীনারায়ণ মিনা সরকারীভাবে ঘোষণা করেন সিদ্ধার্থ বাবুর মৃত্যুর কথা। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিজের চেম্বারে গুলিবিদ্ধ হলেও সিদ্ধার্থ বাবুর সার্ভিস রিভলবারটি পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, মাত্র দুদিন আগেই সিদ্ধার্থ বাবুর স্ত্রী কন্যা তাঁদের আসল বাড়ি বোলপুর থেকে এসেছিলেন। মঙ্গলবার সকালে সিদ্ধার্থ বাবুর দাদা, সনাতন ঘোষাল বোলপুর থেকে সিদ্ধার্থ বাবুর কাছেই যাচ্ছিলেন। পথে খবর পেয়ে হাসপাতালে চলে আসেন। ঘটনাটি আত্মহত্যা না খুন, সে বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পারেনি পুলিশ।

সিদ্ধার্থ বাবুর দাদা সনাতন ঘোষাল জানান, সিদ্ধার্থ-র পারিবারিক কোন অশান্তি ছিল না। কেন এই ঘটনা ঘটল কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে পৌঁছান আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার লক্ষীনারায়ণ মিনা, এডিসি (পশ্চিম) জে মার্সি, এসিপি (পশ্চিম) বরুণ বৈদ্য সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা। পুলিশ কমিশনার লক্ষীনারায়ণ মিনাকে ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, এই মুহুর্তে কোন কিছুই বলা সম্ভব নয়। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

আইসির মৃত্যু রহস্যে উঠছে নানান প্রশ্ন

বিকেল পর্যন্ত গোটা হাসপাতাল ঘিরে শুধু পুলিশ আর মানুষের ভিড়। নীরবতা ভাঙল ডুকরে ওঠা কান্নায়। সিদ্ধার্থ ঘোষালের পরিবার বোলপুর থেকে এসে পৌঁছায় আসানসোলের বেসরকারী হাসপাতালে। তখনও পুলিশ অফিসার সিদ্ধার্থ ঘোষালকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমেই সিদ্ধার্থ বাবুর দুই মেয়ের পুলিশ আধিকারিকদের প্রতি প্রশ্ন, বাবা মারা গেছে বুঝতে পারছি, কখন মারা গেছে বলুন। জানা গিয়েছে, সিদ্ধার্থ ঘোষালের বড় মেয়ে সোমদত্তা ঘোষাল এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। ছোট মেয়ে অনন্যা ঘোষাল মাধ্যমিক দিচ্ছে। হাসপাতালে যখন হুইল চেয়ারে সিদ্ধার্থ বাবুর মা মিনতি ঘোষাল এলেন। তখন দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কর্মীরাও বাকরুদ্ধ। স্ত্রী অম্বিকা ঘোষালও বাকরুদ্ধ হয়েই হাসপাতাল ঢোকেন। সোজা উপর তলায় মৃতদেহ দেখেন তারা। সেই সময় হাসপাতালে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে, সিদ্ধার্থ বাবুর স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা। সপরিবারে থাকেন বোলপুর প্রফেসর কলোনীতে। শুধু সিদ্ধার্থ বাবু কাজের সূত্রে সালানপুরে থাকতেন। দিনকয়েক আগে স্ত্রী এবং কন্যারা এসেছিলেন সালানপুরে। দুদিন আগেই তারা বোলপুরে ফিরে যায়। তারমধ্যে এমন কি ঘটল কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সিদ্ধার্থ বাবুর পরিবারের। যদিও স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, অপরিমিত জীবন যাপন ছিল সিদ্ধার্থ ঘোষালের। ১০ মাস হল তিনি সালানপুর থানার দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে আসানসোল দুর্গাপুরের বিভিন্ন থানার দায়িত্বে ছিলেন। মাঝে কিছুদিন বারাসত থানার দায়িত্বে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বর্ধমানের আউসগ্রাম থানা হয়ে ফের ফিরে এসেছিলেন সালানপুর থানায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি মহিলা ঘটিত নানান সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সিদ্ধার্থ বাবু। তা নিয়ে এলাকায় অশান্তিও নাকি হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল তার কোন ছবি তুলে তাকে ব্ল্যাকমেলিং করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাঁকে খুন করা হয়েছে এমন বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ কেউ। এমন কি এলাকার কয়লা মাফিয়াদের সাথে টাকা নিয়ে বচসাও হয়েছিল। যদিও বাসিন্দাদের এই দাবীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পুলিশও বিষয়টিকে নিয়ে কোন মন্তব্য করেনি। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আলুর দাম কম ঃ রাস্তায় চাষীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে ধান চাষিদের পরে এবার আলু চাষিদের নাভিশ্বাস অবস্থা। বর্ধমানে মেমারি, জামালপুর, আঝাউর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু চাষিরা আলুর দাম পাচ্ছেন না। পঞ্চাশ কেজি আলুর বস্তা বিক্রি হচ্ছে ১৪০ থেকে ১৮০ টাকায়। এই মরশুমে যেভাবে আলুর উৎপাদন বেড়েছে তাতে খরচের অর্ধেক দামও উঠবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন চাষিরা। নূন্যতম সংগ্রহ মূল্যে সরকার এই আলু কিনলে তাদের কিছুটা সুরাহা হবে বলে মনে করছেন তারা। আগামী কাল থেকে খুলবে কোল্ড স্টোরগুলি। কিন্তু এর আগেই আলুর দাম বস্তা প্রতি ১৪০-১৮০ টাকার মধ্যে। প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বর্ধমানের মসাগ্রাম সংলগ্ন দু নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তার মধ্যে বস্তা বস্তা আলু ফেলে বর্ধমান থেকে কলকাতা ও কলকাতা থেকে বর্ধমান যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয় কৃষক সভার নেতারা। সঙ্গে ছিলেন এলাকার আলু চাষিরা। অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। তাদের দাবি কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে ৫০ কেজি বস্তার আলু ৩৫০ টাকা দিয়ে কিনতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। একশো দিনের কাজ করে বকেয়া টাকা পায়নি কর্মীরা। অবিলম্বে সেই টাকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া রেশন ব্যবস্থা নিয়ে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। যদিও এই বিষয়গুলি নিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে মেমারি-১ ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এদিন জামালপুরের বিধায়ক সমর হাজরা জানান, ধান চাষের পরে ফের আলু চাষিরা জর্জরিত, আজ চাষির নাভিশ্বাস উঠছে। আলু চাষের জন্য ব্যাংক থেকে সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছে। কিন্তু উৎপাদনের পরে বাজার মূল্য এত কমে গেছে সেই আলু চাষি বিক্রি করতে পারছে না। চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে ফের চাষিদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। তাই আমাদের দাবি ধানের মতো আলুরও ন্যায্য মূল্য ঘোষণা করতে হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আগামীকাল থেকে হিমঘরগুলিতে আলু ভরতি করার কাজ শুরু হবে তার আগেই আলুর বাজার মূল্য তলানিতে এসে ঠেকেছে। প্রতিবাদে কৃষক সভার সাথে আজ চাষিরা এই রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষক সভার জেলা সদস্য আনতাজ আলি দফাদার, কৃষক নেতা সমর ঘোষ, সুকান্ত কোঙার, অভিজিৎ কোঙার প্রমুখ।

নার্সিংহোম নিয়ে বৈঠকে জেলাপ্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ নার্সিংহোমে কোনো রোগী মারা গেলে মরদেহ আটকে রাখা যাবে না। নার্সিং হোমগুলিকে এই কড়া নির্দেশ দিল বর্ধমান জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সংস্কৃতি লোকমঞ্চে জেলার প্রায় শতাধিক নার্সিং হোমের মালিকের সঙ্গে প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে একটি বৈঠকে বসেন। নার্সিং হোম নিয়ে জেলা তথা রাজ্য জুড়ে একের পর এক ঘটনায় যেভাবে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে তাতে রোগী ও নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য জেলা প্রশাসন এই বৈঠকের ডাক দেয়। প্রশাসনের আশ্বাসে সাড়া দিয়ে আসানসোল, দুর্গাপুর, কালনা কাটোয়া ও বর্ধমান থেকে নার্সিংহোম মালিকেরা যেভাবে প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা শাসকের চেম্বারে এসে হাজির হয় তাতে নার্সিং হোমের মালিকের ভিড় উপচে পড়ে। এতে তিন তিন বার প্রেক্ষাগৃহ পালটে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে বৈঠক করা হয়। সেখানে নার্সিং হোম মালিকেরা বর্ধমানের পিজি নার্সিং হোমের ঘটনায় মালিক সহ চার জনকে পুলিশ গ্রেফতার করায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বলে প্রশাসনকে জানান।

এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম নীতি মেনে চললে কোনো সমস্যাই হয় না বলে মত প্রকাশ করেন জেলাশাসক। এইভাবে দীর্ঘ ঘন্টা দেড়েক ধরে প্রশাসন ও নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর বিনিময় চলে। কেশবগঞ্জ চটির উডল্যান্ড নার্সিং হোম মালিক সোমনাথ দাস প্রশ্ন করেন যে কোনো রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলে আমরা কি করতে পারি। সেক্ষেত্রে চিকিৎসার টাকা না নেওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করতেই জেলাশাসক পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন মারা গেলে বডি আটকে রাখা যাবে না। টাকা দিতে না পারলে রোগীর পরিবারের কাছ থেকে জোর করে টাকা নিতে পারবেন না। এই ব্যবসায় যখন নেমেছেন তখন আপনাদেরই তা বহন করতে হবে। যদিও এক্ষেত্রে এই ধরনের মানুষ এক থেকে দুই শতাংশ হতে পারে। এর বেশি হয় না। এ ব্যাপারে জেলাশাসকের পরামর্শ গুরুতর রোগীদের ভরতি না করে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। অ্যাপেলো নার্সিং হোমের ডাঃ এস কে দাস বলেন, বিভিন্ন নার্সিং হোমের চার্জ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে মানুষের মধ্যে। এক্ষেত্রে প্রসাসনের পক্ষ থেকে রেট চার্ট তৈরি করে দিলে ভালো হয়। উত্তরে জেলাশাসক বলেন, প্রশাসনের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আপনারাই আপনাদের সংগঠিতভাবে নিজেরাই প্যাকেজ তৈরি করুন এবং সেই প্যাকেজ নার্সিং হোমগুলিতে টাঙিয়ে দিন। জেলাশাসক বলেন, রোগীদের সঙ্গে ভালো না করার অভিযোগ আছে নার্সিং হোমগুলির বিরুদ্ধে। প্রতি মাসে তাদের রিপোর্ট আসার কথা। আমরা তা পাই না। তারা রোগীর রেকর্ড রাখছে না। চিকিৎসার ডবল চার্জ নেওয়া হচ্ছে। দালালের মাধ্যমে রোগী ভরতি করার অভিযোগ আছে। দামি ব্র্যান্ডের ওষুধ ইচ্ছাকৃত লেখা হচ্ছে। অকারণে একগাদা পরীক্ষা করানো হচ্ছে। প্রশিক্ষণহীন স্টাফ থাকায় সমস্যা বাড়ছে। ফায়ার সিস্টেম নেই। রোগীর সেফটি সিকিউরিটি নেই। পরিদর্শনে গিয়ে ডেট পেরিয়ে যাওয়া বাতিল ওষুধ ও বাতিল রক্তের প্যাকেট পাওয়া গেছে। বেডের সংখ্যা অনুমোদন নেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি বলে প্রমাণ মিলেছে। এই সব পরিকাঠামো ঠিক ঠাক রাখার জন্য নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রণব রায় বলেন, নার্সিং হোম গুলিকে পাঁচটি বেড অন্তর একজন জি এন এন ও কুড়িটি বেড অন্তর একজন আর এম ও থাকা আবশ্যিক। কিন্তু কেউই সেই নিয়ম পালন করছে না বলে তার অভিযোগ। সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, রোগী ও রোগীর লোকদের সঙ্গে নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকের মতো ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আসানসোলে চালু হল পাসপোর্ট কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ দাবি ছিল দীর্ঘদিন ধরেই আসানসোলে একটি পাসপোর্ট দফতর করা হোক। সেইমত আসানসোলের সাংসদ হওয়ার পরেই পাসপোর্ট শিবির করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এবার আসানসোল বড় পোস্ট অফিসে স্থায়ী পাসপোর্ট সেন্টার করা হল। আসানসোলবাসীকে আর পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজে বারবার কলকাতায় যেতে হবে না। মঙ্গলবার সকালে আসানসোল মূখ্য ডাকঘরে এই পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন বাবুল সুপ্রিয়। এটিই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পোস্টঅফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র হল। এর সঙ্গে সঙ্গে এদিন আরও তিনটি পোস্ট অফিস সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয় এদিন। সেগুলি হল কৃষ্ণনগর হেড পোস্টঅফিস, রায়গঞ্জ মুখ্য ডাকঘর, বিডন স্ট্রিট মুখ্য ডাকঘর কলকাতা। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাবুল সুপ্রিয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল ওয়েস্টবেঙ্গল সার্কেল, রিজিওনাল

পাসপোর্ট অফিসার শ্রী বিভুতিভূষণ কুমার, পোস্টমাস্টার জেনারেল সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন শ্রী ললিতেন্দু প্রধান, ডেপুটি পাসপোর্ট অফিসার শ্রী আশীষ মিধ্যা।

এদিন ললিতেন্দু প্রধান বলেন, ডাকসভা বহু পুরোনো আমল থেকে জনসেবায় নিয়োজিত, এখানে প্রধানত ৫ ধরনের সেবা দেওয়া হয়। বিভুতিভূষণ কুমার জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম চার জায়গায় এই সেবা কেন্দ্র হচ্ছে। ৫৬টি করা হবে প্রথম ধাপে। এখান থেকে আপাতত বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া পাসপোর্ট সেবা দেওয়া হবে। তৎকাল সেবা দেওয়া হবে না। এই কাজের জন্য ৫০ জনকে নিয়োগ করা হচ্ছে। অরুন্ধতি ঘোষ জানান, এই কাজ আমাদের কাছে নতুন। তাই আমাদের কাছে সুষ্ঠু পরিষেবা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ। এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানান, এতদিন কলকাতা গিয়ে পাসপোর্ট করতে মানুষের অনেকটা সময় চলে যেত। আমি সুষমা স্বরাজকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তখনই আমাকে আশ্বস্থ করেছিলেন। তারপর তিনি চিঠি দিয়ে এই চার জায়গায় পোস্ট অফিসে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র করার কথা জানান। বাবুল বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজনীতি ভুলে কর্পোরেশন, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার মিলিতভাবে উন্নয়ন করতে চায়। তবে সেই উন্নয়নের পথ আরও মসৃণ হয়। আশা করব উন্নয়নে সবাই সামিল হবেন।

সদ্যপ্রয়াত শিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত সম্পর্কে স্মৃতিচারণ ঃ বনশ্রী ও আরামবাগ

বিভাংশু দত্ত

১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি চলে গেলেন। নীরব প্রস্থান। সংগীততারকা মিলিয়ে গেলেন আকাশের অগণ্য তারকার মধ্যে। বেঁচে রইল দূর আকাশে তাঁর সুর। রেখে গেলেন আরামবাগের অসংখ্য বনশ্রী-অনুরাগীকে। যে শহরে তিনি চার-চারবার অতিথি হয়ে এসেছিলেন সংগীতশিল্পীর ভূমিকায়।

বনশ্রীর বাপের বাড়ি এই জেলারই সদর শহর চুঁচুড়াতে। বারো জন ভাইবোনের মধ্যে বনশ্রী ছিলেন দ্বিতীয়। বাবা শৈলেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সংগীতজ্ঞ। তাঁর কাছেই বনশ্রীর প্রথম সংগীতশিক্ষা। বিয়ে হয় শান্তি সেনগুপ্তর সঙ্গে। বিয়ের পরেই সংগীতশিল্পী হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাই, পৈতৃক পদবি ‘রায়’ হলে কী হবে। বিবাহোত্তর পদবি ‘সেনগুপ্ত’ এই তাঁর পরিচিতি-জনপ্রিয়তা। বনশ্রী রায় নয়, বনশ্রী সেনগুপ্তকেই আমরা চিনি। রঙিন খামে যত্নে লেখা থাকত তাঁর নাম-‘বনশ্রী সেনগুপ্ত’।

এই কিংবদন্তির গায়িকা আরামবাগ শহরে প্রথম এসেছিলেন ১৯৬৭তে আরামবাগ কলেজ ছাত্র সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। তখন বনশ্রীর নিজের গান বলতে তেমন ছিল না। তিনি সেদিন লতা ও আরতির কয়েকটা জনপ্রিয় গান গেয়েছিলেন। আজও আমার কানে বাজে বনশ্রী গাইছেন লতার গাওয়া ‘মণিহার’ এর সেই অতি জনপ্রিয় গান ‘নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝি বা পথ ভুলে যায়’।

দ্বিতীয়বার এসেছিলেন অনেক বছর পরে। আঠাশ বছর পরে ১৯৯৫ এর নভেম্বরে আরামবাগ পৌরসভার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন মিঠুন চক্রবর্ত্তী, গায়ক অভিজিৎ, তরুণ চক্রবর্ত্তী এবং অবশ্যই বনশ্রী সেনগুপ্ত। সেদিন বনশ্রী শুরু করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘সুশান্ত শা’ ছবির সেই বিখ্যাত গান দিয়ে ‘সজনি লো, দেখে যা উথালি পাথালি হল মন’। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এটা ভেবে যাঁর ভান্ডারে নিজের গাওয়া এত জনপ্রিয় গান তিনি গাইছেন কিনা হেমন্তের গান। পরে বুঝলাম, এই গানের সুরকার প্রবাদপ্রতিম সুধীন দাশগুপ্ত যিনি ছিলেন বনশ্রীর শিক্ষাগুরু। সেদিনের বনশ্রীর এই গান তো নিছক গান নয়, এ যেন তাঁর গুরুদক্ষিণা। তাঁর আর এক শিক্ষাগুরু আদতে চুঁচুড়ারই মানুষ বিখ্যাত গীতিকার সুরকার গায়ক জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জটিলেশ্বরের কথায় ও সুরে বনশ্রীর গাওয়া আর এক বিখ্যাত গান ‘আমার অঙ্গে জ্বলে রং মশাল’। সেগানটাও তিনি সেদিন গেয়েছিলেন। সেদিন তাঁর ‘আজ শুধু খেলা’, ‘হিরা ফেলে কাচ’, ‘ছিছিছি একী কাণ্ড করেছি!’ ‘অন্ধকারকে ভয় করি’ ‘অর্চনা’ ছবির ‘দূর আকাশে তোমার সুর খুঁজে পেলাম’। এছাড়া ‘আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম’ গানতো ছিলই।

এরপর তিনি

আরামবাগে এসেছিলেন ২০০৪ এ নভেম্বরে আরামবাগ গার্লস কলেজের সোশ্যাল অনুষ্ঠানে। তখন বনশ্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠানের আগে আমার প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলার সুযোগ বা সৌজন্য হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন অনুজপ্রতিম সাংবাদিক দিব্যেন্দু সরকার। দিব্যেন্দু বনশ্রীর সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলে দিয়েছিল। সেদিন বনশ্রীর অনেক গানের গীতিকার, সুরকারের নাম, কবে গানগুলো রেকর্ড হয়েছিল সব আমার অভ্যাসবশত তাঁকে বলেছিলাম। তাঁর স্বামী শান্তিবাবু বলেছিলেন, ‘ও তো তোমার সব গানেরই খবর জানে দেখছি। ও তো তোমার দারুণ বড়ো ফ্যান।’ সেদিন আমারই অনুরোধে ‘নিমন্ত্রণ’ ছবির হেমন্তের সঙ্গে গাওয়া তাঁর দ্বৈতকণ্ঠের গান। ‘জনম দুখি কপালপোড়া’ আর মান্না দে-র সঙ্গে ‘হারমোনিয়াম’ ছবির ‘ময়নামতির পথের ধারে দেখা হয়েছিল’ গানগুলো গেয়েছিলেন। এছাড়াও নিজের তাঁর সব হিট গানের সঙ্গে রবীন মজুমদারের যে-গানটা বনশ্রী রিমেক করেছিলেন সেই বিখ্যাত গানটাও সেদিন গেয়েছিলেন ‘আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে’।

এরপরে তিনি এসেছিলেন ২০১২-র পয়লা জানুয়ারি যে বছরের আরামবাগ উৎসবের শেষ দিনে। সেদিন বনশ্রীর গলা ভালো ছিল না। অনেক গানে সুর ঠিক লাগাতে পারছিলেন না। ফলে দর্শক-শ্রোতাকেও তেমনভাবে খুশি করতে পারেননি। তবে সেদিন একটা মজার ব্যাপার আমরা ঘটিয়েছিলাম। তাঁর কয়েকটা জনপ্রিয় গান নিয়ে আমি একটা ছোট্ট নাট্য কোলাজ লিখেছিলাম। অনুষ্ঠানের দুই সঞ্চালক পলাশ ভাণ্ডারী ও মৌলিমতি দে এই নাটকটা উপস্থাপিত করেছিল মঞ্চে বনশ্রীর উপস্থিতিতেই। নাটকটা ছিল এরকম-মঞ্চে পলাশ ঘোষণা করছে হঠাৎ মৌলিমতি মঞ্চে ঢুকে পলাশকে বলছে,

মৌলি : ‘আরে, তুমি এখানে? আজ বিকেলের ডাকেই তো তোমার চিঠি পেলাম।

পলাশ : সত্যি! আমিও মেলা থেকে ফেরার সময় দূর আকাশে তোমার সুর খুঁজে পেলাম।

মৌলি : আজ আমি কেমন সেজেছি দেখো। চাঁপা ডুরে শাড়ি পরেছি। একটা বাহারি খোঁপাও করেছি। আর দুহাতে কী সুন্দর রেশমি চুড়ি পরেছি দেখো। ভালো লাগছে না?

পলাশ : দারুণ! কী বলব! তোমাকে দেখে না আমার অঙ্গে রংমশাল জ্বলে উঠল।

মৌলি : এই জানো তো কী হয়েছে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

পলাশ : ছি ছি ছি করছ কেন? কী হয়েছে বলবে তো।

মৌলি : ছি ছি ছি! একী কাণ্ড করেছি। আমি না সুখের ঘরের চাবিটাকে হারিয়ে ফেলেছি। ছি ছি ছি।

পলাশ : ও ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে? শোনো বাঁচতে যদি চাও তো তবে প্রাণটা ফেলে বাঁচো। চাবিটাকে খুঁজে নাও।

মৌলি : খুঁজব কী করে? অন্ধকার যে। জানো না আমি যে অন্ধকারকে ভয় করি। এসো না তোমার হাত ধরি।

পলাশ ও মৌলি (একসঙ্গে হাতে হাত ধরে) আজ শুধু খেলা। এই রংঝরা বেলা, বনশ্রীদির গানে জমুক আরামবাগের মেলা।

এই ছোট্ট কোলাজ শুনে বনশ্রী সেদিন দারুণ খুশি হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার গানকে নিয়েও যে নাটক হতে পারে। আমি কোনোদিন ভাবি-ই নি।’ পলাশ আর মৌলিমতিরও দারুণ প্রশংসা করেছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর আরামবাগে শেষ আসা। আমরা শহরবাসী স্মৃতিভারে পড়ে আছি। এখনও চোখ বুজলে দূর আকাশে তাঁর সুর খুঁজে পাই। জন্মান্তরে কোনও এক বিকেলের ডাকে তাঁর হয়তো একটা চিঠি পাব।